আত্মকথা
ও
আলাপচারিতা

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সংকলন ও সম্পাদনা
এস এম জাহাঙ্গীর কবীর

ঐতিহ্য

সংকলন-প্রসঙ্গে

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বাংলার আপামর খেটে খাওয়া মানুষের নয়নের মণি। শতাব্দীর সিংহপুরুষ ভাসানী আসাম থেকে শুরু করে পূর্ববাংলার পথে-প্রান্তরে অধিকারবঞ্চিত মানুষের কথা বলতে গিয়ে শাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক দল গঠন থেকে শুরু করে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি যেমন ছিলেন অগ্রণী তেমনি স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ভাষা আন্দোলন, বাংলার স্বায়ত্ত্বশাসনের লড়াই, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে মওলানা ভাসানী ছিলেন রাজপথে-জনপথে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে লণ্ডভণ্ড পূর্ববাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের মুখে ঘৃণা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এই বলে, 'ওরা কেউ আসেনি।' একই ভাসানী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিবেশী ভারতের চাপিয়ে দেওয়া খরা বিষয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ফারাক্কা লংমার্চ বাস্তবায়ন করে।

আজীবন স্বাধীনতা ও সাম্যের সংগ্রামী মওলানা ভাসানী পূর্ণাঙ্গ কোনো আত্মজীবনী রচনা করে যেতে পারেননি, তবে সারা বাংলার মাঠে-ঘাটে জড়িয়ে আছে তাঁর আত্মকথা।

বর্তমান সংকলনে আমরা মওলানা ভাসানীর আত্মকথামূলক বেশকিছু রচনা প্রিয় পাঠকের জন্য নিবেদন করলাম যাতে ভাসানীর জীবন ও দর্শন বিষয়ে সবাই বিশদ ধারণা লাভ করতে পারেন। সংকলনের দ্বিতীয় অংশে জীবনের বিভিন্ন সময় সাংবাদিক ও অন্যান্যের সঙ্গে তাঁর মূল্যবান কথোপথনও সংকলিত হলো যার মধ্য দিয়ে আলাপচারী মাটির মানুষ ভাসানীর প্রতিকৃতি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে।

ভাসানী পরিবার এবং যেসব সূত্র থেকে এসব রচনা ও আলাপচারিতা সংগৃহীত হয়েছে, তাঁদের সবার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতার স্বার্থে সংকলনে রচনাসমূহ প্রকাশমুহূর্তের বানানরীতি অক্ষুণ্ন রাখা হলো।

এই সংকলন প্রস্তুত ও প্রকাশে প্রিয় সহকর্মী কবি পিয়াস মজিদের আন্তরিক সহযোগিতা সবসময় স্মরণে রাখব। বই আকারে প্রকাশের জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'ঐতিহ্য'র প্রধান নির্বাহী জনাব আরিফুর রহমান নাইম ভাইয়ের প্রতি।

কম্পোজের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেছেন মো. শরীফ হোসেন, প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছেন আবু ইকবাল বিপ্লব; তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে মওলানা ভাসানীর অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এস এম জাহাঙ্গীর কবীর
জানুয়ারি ২০২৫

সূচি

আ ত্ম ক থা

অতীত দিনের কথা ১৩
স্মৃতিকথা ২৬
জাতীয় চেতনার উজ্জ্বল তরঙ্গ ৩১
রবুবিয়াতের ভূমিকা ৩৪
নিজের রাজনৈতিক দর্শন ৩৯
অহিংসা ও বিপ্লব ৪১
সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে জরুরি কথা ৪৬
শান্তির রূপালী রেখা ৫০
শেষ অভিভাষণ : খোদা-ই-খিদমতগার ৫৭

আ লা প চা রি তা

বোম্বেতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি ভাসানী ৬৩
মহীপুরের প্রান্তর ৬৫
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ফজলে লোহানী ৬৫

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কথোপকথন ৮১
আলাপন : দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা ৮১

সাক্ষাৎকার ১৯৭৩ ১৫০
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : এনএম হারুন ১৫০

মওলানা ভাসানীর শেষ সাক্ষাৎকার ১৫৫
আলাপন : জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম ১৫৫

প রি শি ষ্ট

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবনপঞ্জি ১৬৫

অতীত দিনের কথা

বাংলা ১৩২৯ সালের কথা। আশ্বিন মাস। হঠাৎ প্রবল বন্যা শুরু হইয়া গেল। এই বন্যায় উত্তর বঙ্গ বিশেষ করিয়া বগুড়া, রাজশাহী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ভাসিয়া গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষের মাটির দেয়ালের গৃহ ও প্রাচীর বন্যার স্রোতে ধ্বসিয়া পড়িল, রেল-যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, রেল লাইনের উপর তিন ফুট হইতে সাড়ে তিন ফুট বন্যার পানি উঠিয়া গেল, মাঠের রোপা ধান, রক্তদহ বিলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় রোয়া ধান, নওগাঁর গাঁজা চাষের অঞ্চলের ফসলাদী সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল, সুউচ্চ পুষ্করনির পাড়ে স্থান না হওয়ায় ঘরের চালের উপর, গাছের ডালে সাপ মানুষ পক্ষী সব একই সঙ্গে তিন দিন, তিন রাত যাবৎ অনাহারে বাস করিতে লাগিল। হাজার হাজার গরু, মহিষ অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু এবং অসংখ্য মানুষ পানিতে ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করিতে লাগিল।

সেই সময় ভারতের অন্যতম দেশদরদী চিত্তরঞ্জন বসু, স্যার পি, সি, রায় প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের নেতৃত্বে "সংকটত্রাণ" সমিতি গঠন করা হয়। তাহাতেই আমি, মরহুম জালাল উদ্দিন হাসেমী, ভগবান দাস, শুভাষ চন্দ্র বসু, বগুড়ার বিখ্যাত দেশপ্রেমিক যতীন দাস প্রভৃতি যোগদান করিয়া ১৩২৯ সালের আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত চিড়া, গুড়, চাউল, কম্বল, পরিধানের বস্ত্র, গৃহাদী নির্মাণের জন্য বাঁশ, নগদ টাকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বন্যাপীড়িত এলাকার দুস্থ লোকদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলাম।

বাংলার ইতিহাসে এত বেশী নগদ টাকা, কাপড়, চিড়া, গুড়, ঔষধ প্রভৃতি আর কোনো সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। এবং এইভাবে শুধু বণ্টন এবং মানুষকে বাঁচাইয়া স্বাবলম্বী করিবার ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত যত সরকারী-বেসরকারী রিলিফের কাজই হইয়া থাকুক না কেন তাহার সহিত ঐ সকল কাজের তেমন কোনই সামঞ্জস্য নাই। ইহার মূলে ছিল আদর্শপরায়ণতা এবং নিঃস্বার্থভাবে কৃষক মজুরদের প্রতি মানবতাবোধ, দরদ, প্রেম ও ভালবাসা।

* * * *

১৩৩৭ সালে টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং পূর্ব বগুড়ায় এক ভয়াবহ বন্যায় বহু ঘর, দরওয়াজা, গরু, মহিষ, ছাগল ভাসাইয়া লইয়া গেল। মানুষ চরম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হইল।

জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আমি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য একটি রিলিফ কমিটি গঠন করিলাম। এ রিলিফ কমিটির মাধ্যমে কলিকাতা নগরী হইতে চাউল, কাপড়, নগদ টাকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বন্যা পীড়িত এলাকায় বিতরণ করি। এই বিতরণ কার্য যাহাতে সুষ্ঠু হয়, সাহায্যাদী যাহাতে প্রকৃত দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের হাতে গিয়া পৌঁছিতে পারে তাহার জন্য স্থানীয় সমাজ সেবী কর্মীদের নিয়া রিলিফ কমিটি গঠন করিয়া সাহায্যাদী তাহাদের দ্বারা বিতরণের ব্যবস্থা করিলাম।

এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে কৃষকসভা করিয়া প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে দাবী করিতে এবং দুর্গত অঞ্চলের খাজনা, ট্যাক্স, ঋণ মওকুফ কবিবার আন্দোলন চালাইতে লাগিলাম।

এই সময়কার একটি ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলনের কথা বারে বারে আমার মনে পড়িতেছে। এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল টাঙ্গাইল মহকুমার চাড়াবাড়ী ঘাটে। এই সম্মেলনে ঋণ শালিসী বোর্ড করিয়া দীর্ঘ কিস্তিবন্দীতে ঋণ দেওয়ার দাবী এবং কৃষক জনসাধারণের ন্যায়সংগত দাবী পূরণের জন্য সরকারের উপর বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশের গোলামী যুগে আর যাহাই হউক না কেন তৎকালীন বিদেশী শাসকবর্গ জনজমায়েতের দাবী সম্পর্কে খুবই তৎপর ছিল। তাহারা গণদাবীর প্রতি আস্থাশীল না হইলেও বেশ ভয় করিত এবং এই সকল দাবীসমূহ বিবেচনার জন্য আগাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।

সেই সময় আমাদের সাথে ঐরূপ রিলিফের কাজ রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, প্রভাতী জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কয়েক মাস যাবৎ চালাইয়াছিল। সবসময়ই দেখা গিয়াছে যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাকার বিপদকালে কেবলমাত্র সরকারী সাহায্য প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণ তেমন কোনো উপকার লাভ করিতে পারে নাই।

* * * *

১৩৩৭ সাল। টাঙ্গাইল মহকুমার রিলফের কাজ শেষ হওয়ার পর, আমি একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া মহেরার জমিদার মহাজনদের অত্যাচারে জর্জরিত

কৃষক খাতকদের দুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য টাঙ্গাইল হইতে কাগমারী যাইতেছিলাম। কাগমারী হইতে জিলা বোর্ডের যে রাস্তাটি দিল দুয়ারের দিকে গিয়াছে, উক্ত রাস্তা দিয়া যাইবার কালে কাগমারী পরগনার মূল মালিক হজরত পীর শাহজামানের মাজারের নিকট ভাল্লুককান্দি গ্রামের শাহ রুস্তম আলী ফকিরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি প্রায় একশত জন মুসলমানসহ আসিয়া কাগমারী মসজিদ ও মাজারের ভগ্ন অবস্থা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহাদের অনুরোধ অনুযায়ী আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া বেতকাটা জঙ্গলের ভিতরে বহু কষ্টে ঢুকিয়া উক্ত মাজার জেয়ারত করিলাম। দেখিলাম মাজারের উপর মাত্র দুই-তিনখানা টিন ছিল, পাকা কবর প্রায়ই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নাম মাত্র নিশানা ছিল। মসজিদের অবস্থা আরও খারাপ। কোন প্রকারে স্থানীয় কয়েকজন লোক শুক্রবারে মাত্র জুম্মার নামাজ আদায় করিত।

শাহ রুস্তম আলী ফকির সহ স্থানীয় মুসলমানগণ উক্ত মাজার ও মসজিদ মেরামত ও হেফাজতের ব্যবস্থা করতে আমাকে অনুরোধ জানান। আমি মসজিদ মাজারের দুরবস্থা দেখিয়া চাড়াবাড়ী ঘাটে আমার এক কাঠ ব্যবসায়ী মুরীদের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া দিলাম— কয়েক খণ্ড শাল কাঠ বাকিতে দিবার জন্য। এক মাসের মধ্যে কাঠের মূল্য পরিশোধ করিব বলিয়া উক্ত পত্রে উল্লেখ করিলাম। আমার পত্র অনুযায়ী কাঠ প্রদান করায় স্থানীয় মুসলমানগণ গরুর গাড়ীতে করিয়া উক্ত কাঠসমূহ মাজার প্রাঙ্গণে লইয়া আসিল।

আমার সাহায্য সহযোগিতায় কাগমারীর মসজিদ, মাজার মেরামত হইতেছে, এই খবর সন্তোষের প্রবল প্রতাপশালী জমিদারগণ অবগত হওয়া মাত্রই তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন ফারুখের শরণাপন্ন হয় এবং আবেদন জানায় যে, কাগমারীর মসজিদ, মাজার, হেফাজত মেরামত করিবার একমাত্র অধিকারী সন্তোষের জমিদারগণ। অন্য কাহারো উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার আইনত কোন অধিকার নাই। অতএব, জমিদার মহাজন বিরোধী ভাসানী ও তাহার শিষ্যদিগকে উক্ত মসজিদ মাজার মেরামতের কাজ হইতে অবিলম্বে বিরত রাখা হউক।

সন্তোষ জমিদার তিন ভাগে বিভক্ত ছিল— পাঁচ আনির মালিক রাজা মন্মথ রায় চৌধুরী, যিনি তৎকালে বঙ্গীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরী,—বড় পাঁচ আনির মালিক, অলোয়া জমিদার বলে পরিচিত ছিলেন। আর ছয় আনির জমিদার জাহ্নবী চৌধুরাণী, ছয় আনির জমিদার নামে পরিচিতা ছিল। জাহ্নবী চৌধুরাণী "জানমারা"

চৌধুরাণী নামেও কুখ্যাত ছিল। তার জমিদারীর ঐতিহ্য অনুযায়ী এই জমিদার বৎসরে ১২টি প্রজা খুন করিত।

কাগমারী মসজিদ মাজারের মেরামতে বাধা প্রদানের জন্য পাঁচ আনি, বড় পাঁচ আনি ও ছয় আনির সকল জমিদার এক জোট হইয়া বৃটিশ সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হইল।

তখনকার দিনে উল্লেখিত জমিদারদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তো দূরের কথা, তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জুতা পায় দিয়া, ছাতি মাথায় দিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া কোন হিন্দু মুসলমান প্রজাই যাতায়াত করিতে পারিত না। অবশ্য কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, বা মুসলমান জমিদারদের বেলায় ঐরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইত না।

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, ডা. মেঘনাথ সাহা নামক জনৈক স্থানীয় ডাক্তার জুতা পায় দিয়া জিলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া যাইবার কালে— সন্তোষ জমিদারের হুকুমে জমিদারদের আমলা, পৈলা, বরকন্দাজ ডাক্তারকে ধরিয়া নিয়া বন্দী করিয়া জুতা দিয়া পিটাইয়াছিল।

ডাক্তারের পিতা খবর পাইয়া— গরু বিক্রয় করিয়া— জমিদারের দরবারে হাজির হইয়া— নজরানা দিয়া ছেলেকে মুক্ত করিয়া নিতে হইয়াছিল।

সন্তোষ জমিদারদের পক্ষে তাহাদের আমলাগণ থানা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সমীপে আমার মুরীদানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া দিল। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট থানা অফিসারকে ১০৭ ধারা মতে আমাদিগকে কঠোর জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করিবার জন্য তৎকালীন থানা অফিসার মৌঃ আবদুল কাদেরকে ডাকাইয়া পরামর্শ দিয়া দিলেন।

তখন আমি নিরুপায় হইয়া তৎকালীন ময়মনসিংহ জিলার এডিশনাল এস, পি, মিঃ জাকির হোসেন সাহেবের নিকট বলি– সন্তোষ জমিদারদের প্রজাপীড়নের কথা এবং এও বলি জমিদাররা কাগমারীর মসজিদ মাজার বহুকাল যাবৎ নিজেরা মেরামত না করিয়া ধ্বংস অবস্থায় রাখিয়াছেন এবং মুসলমান সমাজকে মসজিদ মাজার মেরামত হেফাজত হইতে অন্যায়ভাবে বিরত রাখিয়াছেন। শরিয়ত মোতাবিক মসজিদ মাজার মেরামত আমার ও আমার স্থানীয় মুসলমান মুরীদানদের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য মনে করিয়া, মেরামতের ব্যবস্থা করায়, প্রবল প্রতাপশালী জমিদার ও তাহাদের বিশেষ অনুগত টাঙ্গাইলের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বাধা সৃষ্টি করিতে, মামলা দায়ের করিয়াছেন। স্থানীয় পুলিশ যাহাতে সত্য ঘটনা প্রকাশ করে এবং সত্যভাবে

রিপোর্ট দাখিল করে, তাহার জন্য নির্দেশ দানে বাধিত করিবেন। এই মর্মে এক আবেদন পেশ করিলাম।

মিঃ জাকির হোসেন সাহেব প্রবল প্রতাপশালী জমিদারদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে পারিবেন না বলিয়া অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর মিঃ সি, ভি, মিনিষ্টার সাহেব নামক অন্য একজন ইংরেজ এডিশনাল পুলিশ সুপারের নিকট ইতিপূর্বে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি কয়েক দিন পরে টাঙ্গাইলে উপস্থিত হইয়া তৎকালীন টাঙ্গাইলের এস, ডি, পিও ইউছুফ সাহেব ও থানা ইনচার্জ অফিসারকে ১০৭ ধারা মতে রিপোর্ট প্রদান না করিয়া, ১৪৪ ধারা মতে উভয় পক্ষকে জমিদার ও আমাকেসহ স্থানীয় মুসলমানদের প্রতি শান্তি ভঙ্গ না হয়, জন্য রিপোর্ট দিতে নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানের পর, মহকুমা হাকিম উভয় পক্ষকে কারণ দর্শাইবার নির্ধারিত তারিখে, "শোকজ" কোর্টে দাখিল করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

তখনকার দিনে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মহলে মৌখিক প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, কাগমারী পরগনার মূল মালিক হজরত পীর শাহজামানের মালিকানা সন্তোষের জমিদারের পূর্বপুরুষগণ পীর সাহেবের মৃত্যুর পর জোরজবরদস্তি করিয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করিতেছে।

'শোকজ' দাখিলের পূর্বেই আমি ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি জেলায় ঘুরিয়া বিভিন্ন পুরাতন হস্তলিখিত গ্রন্থাদী, তোগরা অক্ষরে লেখা, ফার্সি ভাষায় লিখিত বহু পুরাতন দলিলাদী, পঞ্চসনা রিপোর্ট, দশসালা বন্দোবস্তের রিপোর্ট, স্যাকসী সাহেবের সেটেলমেন্ট জরীপের রিপোর্ট, নবাব মুর্শিদ কুলি খান আমলের জামায়েল কামেল সুমারী প্রভৃতি দলিলাদী সংগ্রহ করিয়া কোর্টে দাখিল করিলাম।

উল্লেখিত জমিদারদের আদায় তহশিলের যাবতীয় কাগজের উপরে লেখা থাকিত "শ্রী শ্রী পীর শাহ জামান"।

মাজারে দৈনিক এক পোয়া দুধ, এক পোয়া আতপ চাউল, এক পোয়া চিনি মাজারের খাদেমদের দ্বারা 'পায়াশ' পাক করিয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হইত। সমস্ত কাগজাত এবং শিন্নি সালাতের বিবরণ, ময়মনসিংহ জেলার প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লিখিয়া প্রায় ৮ লক্ষ টাকার জমিদারী হজরত পীর শাহ জামানের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বলিয়া 'শোকজে' দাবী করিলাম। এবং জমিদারী ষ্টেটের পুরাতন কাগজ প্রভৃতি কোর্টে উপস্থিত করিবার জন্য কোর্টের জরয়াতে তলব করিলাম।

উক্ত ১৪৪ ধারার 'শোকজের' মামলা পরিচালনার জন্য কলিকাতার বিখ্যাত এডভোকেট ডঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তকে নিযুক্ত করিলাম। তিনি টাঙ্গাইল পৌঁছিয়া আমাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা শুরু করিলে, হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান কোর্ট প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে লাগিল।

প্রথম দিবস মামলা চলিবার পর জমিদার পক্ষ বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় আইনসভার সভাপতি মহারাজা সন্তোষ, স্বয়ং প্রাদেশিক গভর্নর, প্রাদেশিক মন্ত্রী স্যার আবদুল করিম গজনবী, হোম সেক্রেটারী অন্যান্য প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের শরণাপন্ন হয়। আমাকে বিশেষভাবে শায়েস্তা করিবার জন্য এই বলিয়া অভিযোগ দায়ের করে যে, ভাসানী জমিদার ও মহাজনদের ঘোর বিরোধী।

উক্ত মামলা প্যান্ডিং থাকা অবস্থায় বৃটিশ সরকারের ময়মনসিংহ জিলার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রাহাম আই, সি, এস এক জরুরী সরকারী হুকুমনামাবলে আমাকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল।

আমাকে বহিষ্কার করিবার পর জমিদারগণ স্থানীয় গণ্যমান্য মুসলমানদিগকে নানাভাবে, এমনকি যেসকল মুসলমানদের দুই চোখের পাতায় দেখিতে পারিত না, তাহাদিগকে দিবারাত্র জমিদারগণের অন্দর মহলে আরাম আয়েশের জঘন্য সুযোগসুবিধা দিয়া হাত করিয়া নেয়। কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে মাজার মসজিদ মেরামত করিয়া দেয় এবং ১৪৪ ধারা মামলার বহু পরিশ্রমের দলিলাদী, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হইত যে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব কাগমারী পরগনা ইসলাম প্রচারের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তিরূপে হজরত পীর শাহজামান কাশ্মীরিকে দিয়াছিলেন। সেই মূল্যবান কাগজপত্র হাত করিয়া নিল এবং পোড়াইয়া ফেলিল।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ কর্মচারী, প্রবল প্রতাপশালী অত্যাচারী জমিদারদের কারসাজিতে আমার জীবনের বহু পরিশ্রম ও নির্যাতন ভোগ ও বিপুল অর্থ ব্যয় সমস্ত এইভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল।

জমিদারগণ কর্তৃক তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী আলহাজ্জ মরহুম স্যার আবদুল করিম গজনবী সাহেবকে বুঝানো হইয়াছিল যে, মওলানা ভাসানী ও তাহার মুরিদানসহ জমিদার মহাজনদের সমূলে সর্বনাশ করিবে এবং সন্তোষের ওয়াক্ফ সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারলে আপনি ও অন্যান্য মোতাওয়াল্লিগণ যে সমস্ত বিরাট বিরাট ওয়াক্ফ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন তাহাও বেদখল করিতে ভাসানী কৃষক আন্দোলন, অপরদিকে জেলা জজের নিকট মোতাওয়াল্লি ক্যান্সেলের বা বাতিলের বিভিন্ন অজুহাত সৃষ্টি করিয়া মামলা চালাইতেও কসুর

করিবে না। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া হিন্দু মুসলমান জমিদার মহাজন সকলে সংঘবদ্ধভাবে ভাসানীকে বাংলাদেশ হইতে বাহির করিয়া না দিতে পারিলে আর কোন উপায় থাকিবে না। তাই তাহারা আমাকে একেবারে দেশ হইতে তাড়াইবার সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালাইতে লাগিল।

*　　*　　*　　*

১৩৩৮ সালের কথা। দেশের শতকরা ৯২ জন কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ঋণের দায়ে জর্জরিত হইল, বসতের ভিটা, চাষের জমি, হালের গরু, ঘরের আসবাবপত্র হারাইতেছিল তখন দেশের মেরুদণ্ড কৃষক প্রজাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু হইয়া গেল। এই উপলক্ষে সিরাজগঞ্জের কাওয়া খোলা ময়দানে, রংপুরের হাশিয়াল কান্দি ময়দানে, নেত্রকোণায় লক্ষ লক্ষ কৃষক জমায়েত করিয়া সম্মিলিতভাবে দাবী জানান হইয়াছিল—সমস্ত পুরাতন ঋণ মওকুফ মরোটরিয়াম করিতে হইবে, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের খারিজ দাখিলের জন্য জমিদারদের নজর, আমলাবর্গের বেআইনী উপরি প্রাপ্য, খাজনা বৃদ্ধির জুলুম বন্ধ করিতে হইবে। এই সকল দাবীতে তীব্র কৃষক আন্দোলনের ফলেই তৎকালীন দুর্দান্ত বৃটিশ সরকারকে বাধা হইয়া দীর্ঘ কিস্তিবন্দীতে ঋণের টাকা পরিশোধ করিবার, কৃষকদের কটকবলা, সুদ খায় খালাসী নজর, ইত্যাদি রহিত করিয়া বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন এবং ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপন করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

এই সকল কৃষক আন্দোলনে শেরেবাংলা মরহুম এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের সাথে আমিও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম।

আজাদীলাভের পর বর্তমানে জমিদার, তালুকদার, মিরাশদার, পত্তনীদার, জোতরার সমস্ত আনুষ্ঠানিকভাবে লুপ্ত করিয়া তৎস্থলে পাকিস্তান সরকার নিজেই আজ জমিদার হইয়াছেন। এবং দুর্নীতিপরায়ণ একোয়ার্ড এষ্টেটের কর্মচারীদের শোষণ ও জুলুমে অল্পকালের মধ্যেই দেশের প্রজাকুল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্পর্কে ক্ষমতাসীন হইতে শুরু করিয়া, জননেতাগণ নির্লিপ্ত মনে চুপ থাকিয়া কেবল ক্ষমতার কড়িকাঠ গণনা করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছেন। কেননা তাঁহারা এই সকল নির্মম, জুলুমের শিকার হইতে মুক্ত রহিয়াছেন।

কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে এ ব্যাপারে চুপ থাকা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাহাদের কোনক্রমেই হতাশ ও নিরাশ হইলে চলিবে না। যে প্রবল প্রতাপশালী সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ সরকারের রাজত্বে সূর্য উদয় হইত অস্ত যাইত না সেই সরকারকেও যখন গণ-আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন দ্বারা

তাড়ানো সম্ভব হইয়াছে, যখন তাহাদের তুলনায় পাকিস্তান সরকারের একোয়ার্ড এষ্টেটের শক্তি ও ক্ষমতা অতি নগণ্য তখন তাহাদের শোষণ ও জুলুম বন্ধ করিতে শুধু কেবল দরকার তাহাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা দেশময় সংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়, প্রতিটি ইউনিয়নে-ইউনিয়নে কৃষক সংগঠন করিয়া, সম্মিলিতভাবে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়িয়া তোলা।

*　　*　　*　　*

১৯২৯ সালে স্যার পি, সি, রায়ের নেতৃত্বে "সংকট ত্রাণ" প্রতিষ্ঠানের জরিয়তে, পুরা সাত মাস কাল, উত্তরবঙ্গের বন্যাপীড়িত লোকদের মধ্যে সাহায্য প্রদানের কাজ শেষ হওয়ার পর, বগুড়া জেলার অন্তর্গত আদমদীঘি থানার অধীন গোপীনাথপুর গ্রামের কৃষ্ণ বল্লভ প্রিয়ার বাড়ীতে যে রিলিফ সেন্টার ছিল সেখানে বসিয়া আমি, ভগবান চন্দ্র দাস, কৃষ্ণ সুন্দর ভৌমিক, মাদারী সিকদার, বিশ্বনাথ মণ্ডল, আবদুল কাদের সরকার, মরহুম জালাল উদ্দিন হাশেমী প্রভৃতি কংগ্রেস কর্মীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কৃষক মজুরদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন ও তাহাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ বা উন্নতি একমাত্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দ্বারা সম্ভবপর হইবে না। কারণ, কংগ্রেসে যাহারা উপরতলার নেতৃত্ব করেন তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশই ধনিক, বণিক, জমিদার, বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক। তাহাদের উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা— বৃটিশ সরকারকে আংশিকভাবে তাড়াইয়া প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও অপ্রত্যক্ষভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতবর্ষের কৃষক, মজুর, কুটির শিল্পী প্রভৃতি যাহাদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯০ জন, তাহাদের উপর প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব করা ইংরেজরা যেভাবে তাহাদিগকে জমিদার, মহাজন প্রভৃতি দেশীয় শোষকদিগকে এজেন্ট বানাইয়া তাহাদিগকে শোষণ ও পদানত করিয়া রাখিত সেই একই নীতি অবলম্বন করিয়া নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ বজায় রাখা। তাই আমরা কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়ি। এবং ক্ষুদ্র একটি কৃষক সমিতি গঠন করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে এবং যেখানে প্রকাশ্যে সম্ভবপর নহে সেখানে গোপনে কৃষক মজুরদের মধ্যে তাহাদের সমস্যাবলী এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি? তাহা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রচার করিতে থাকি।

তৎকালে স্যার প্রদ্দ্যত কুমার ঠাকুর, জমিদার তাজহাটের মহারাজ, দিনাজপুরের মহারাজা রায় সাহেব, বগুড়ার নবাব ষ্টেট, দুবল হাটির জমিদার, কাশিমপুরের মহারাজা, দিঘাপাতিয়া, নাটোর, পুটিয়ার মহারাজা— নড়াইল প্রভৃতি জমিদারদের প্রতাপে ও তাহাদের কর্মচারীদের অত্যাচারে সাধারণ

কৃষক প্রজাগণ ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করিত। জমিদার ও তাদের আমলাবর্গের সামান্যতম অবাধ্য হইলে পুলিশের সাহায্যে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী প্রভৃতি মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া হাজার হাজার কৃষকবর্গকে তাহাদের ভিটামাটি হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিত।

জমিদারদের আমলাবর্গ ঘুষ লইয়া, একের জমি অন্যের নিকট পত্তন দিয়া এবং বিভিন্ন প্রকারে ইংরেজদের "ডিভাইড এণ্ড রুল" নীতি অনুযায়ী প্রজাদের মধ্যে সর্বদাই বিবাদ বাঁধাইয়া রাখিত। তখনকার দিনে গ্রাম্য প্রধান মাতুব্বরদিগকে হাট-বাজার, জমিদারী এলাকার গুদারাঘাটে (খেয়াঘাটে) পারাপার হইতে মাশুল বা কোন কর দিতে হইবে না, জমিদার কাচারীতে গেলে দুই এক সন্ধ্যার খোরাকী পাইবে এবং আমলাবর্গ মফঃস্বলে গেলে ঐ সমস্ত মাতুব্বরদের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া, প্রজা শাসনে তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিবে ইত্যাদি মর্মে হুকুম নামা বা সনদ প্রদান করিত। ঐ সনদ বা হুকুম নামার ফলে গ্রাম্য মাতুব্বরগণ সর্বদাই জমিদারদের এজেন্ট বা সি, আই, ডি রূপে কাজ করিত। কোন কৃষক দরদী লোক প্রজাদের মধ্যে, প্রজা আন্দোলন করিতে পরামর্শ দিলে, ঐ সমস্ত মাতুব্বরগণই নিজ নিজ এলাকার জমিদার কাচারীতে উপস্থিত হইয়া, সত্য মিথ্যা নানারূপ কথা জমিদার কর্মচারীদিগকে জানাইয়া, কৃষক দরদী কর্মীদের উপদেশ যে সমস্ত প্রজা গ্রহণ করিত, তাহাদের উপর থানার পুলিশের সহযোগিতায় বা এককভাবে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া অমানুষিকভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিত।

তখনকার দিনের জমিদারী ও পুলিশের অত্যাচার ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্য কেহই বুঝিতে পারিবে না বা ভাষায় ব্যক্ত করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

নীল চাষের সময় নীল কুঠির সাহেবদের অত্যাচার, তেভাগা আন্দোলনে অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা, মহাজনী ঋণের অত্যাচার, বৃটিশ আমলের সেটেলমেন্টের সময় পাঁচ ধারার, খাজনা বৃদ্ধির অত্যাচারের কথা স্মরণ পড়িলে আজও আমার সমস্ত শরীর বিষাইয়া উঠিতে চায়।

এই যুগে প্রজাগণ নিজ জমিতে পুষ্করণী, ইন্দারা খুঁড়িতে পারিত না, নিজের জমিতে গাছ বপন করিয়া তাহা কাটিয়া নিজের প্রয়োজনীয় জানালা, কপাট, চৌকাট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিত না। নিজের বসতবাটিতে পাকা গৃহ, পাকা ইটের মসজিদ, মন্দির নির্মাণ করিতে পারিত না, ছেলের বিবাহ

পিতামাতার ফাতেহা, শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে হইলেও অগ্রে জমিদারের মার্চা, নজরের মোটা অর্থ প্রদান না করিলে— করা যাইত না। ইত্যাদি শত রকমের অত্যাচার জুলুম দীর্ঘদিন যাবৎ প্রজাসাধারণ ভোগ করিয়াছে।

পেটের ভাত, পরনের কাপড়, ছেলের বিবাহ ইত্যাদিতে অর্থের অভাবে সুদখোর মহাজনদের দ্বারস্থ হইয়া, তাহাদের ইচ্ছামত সুদ প্রদানের অঙ্গীকারে, টাকা ধার করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুদের সুদ, তস্য সুদসহ মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া (বংশানুক্রমে) বসতের ভিটা, চাষের জমি, সুদখোর মহাজনদের দখলে ছাড়িয়া দিয়া দিনমজুরে পরিণত হইতে হইয়াছে। কেহ কেহ মাতৃভূমির মায়া চিরকালের তরে পরিত্যাগ করিয়া আসামের বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে। সেখানেও নিস্তার ছিল না— বাঘ ভাল্লুক, ম্যালিরিয়া, কালাজ্বর, জোঁক, মশা, লাইন প্রথা ইত্যাদির অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

আসামের বাঙ্গাল খেদা আন্দোলনের ফলে লাইন প্রথা তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ সরকার ও আসামের বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃবর্গ আইনের সাথে বে-আইনীভাবে একটি অত্যাচারমূলক এবং আসামী-বাঙ্গালী প্রজাদের মধ্যে বিভেদমূলক আইন সৃষ্টি করে। যাহাতে বাঙলা প্রদেশ হইতে যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান কৃষক, মজুর, জেলে শ্রেণীর লোক আসামে গিয়া স্বাধীনভাবে জমিজমা ক্রয় করিয়া, বসতবাটি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে না পারে। যদিও তখন আসামে তিন-চার কোটি লোকের বসবাস উপযোগী পতিত জমি পড়িয়া ছিল। যদিও বাঙ্গালীদিগকে পত্তন দিলে কোটি কোটি টাকা সরকারের রাজস্ব বিভাগে আয় বৃদ্ধি হইত। তবুও একমাত্র বাঙ্গালী বিদ্বেষ, ভীতির জন্যই কোটি কোটি একর জমি পতিত ফেলিয়া রাখিয়া কয়েকটি গরু, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি প্রতিপালনের নামে রিজার্ভ রাখা হইত।

সামান্যতম জমির ভিতর বাঙ্গলা হইতে যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান কৃষক মজুর ভাতের দুঃখে আসামে যাইত, তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া বা সীমানা দিয়া লাইন টানিয়া পাকা পিলার স্থাপন করিয়া সরকারী আদেশ ঘোষণা হইত— "এই সকল পিলার চিহ্নিত লাইন ও পিলারের বাহিরে কোন বাঙ্গালী কৃষক মজুর জমি পত্তন বা ক্রয় করিতে পারিবে না। কোন আসামী মেয়ে মানুষ নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ সাদী করিলে বা দিলে মুসলমানী ও হিন্দু আইন অনুযায়ী লাইনের বাহিরে কোন সম্পত্তি ওয়ারিশক্রমে দাবী করিবার অধিকার থাকিবে না। সরকারী বাকী করের জন্য কোন আসামী প্রজার জমি নিলাম হইলে উক্ত নিলামীয় সম্পত্তি কোন বাঙ্গালী হিন্দু হউক,

মুসলমান হউক, ক্রয় করিতে পারিবে না। আসামীদের লাইনের মধ্যে জলমহলে মৎস মারিবার বা জলমহলের ইজারা লইবার কোন অধিকার বাঙ্গালীদের থাকিবে না। আসামী লাইনের মধ্যে হাট-বাজার ইত্যাদি ডাকার অধিকারও কোন বাঙ্গালীদের থাকিবে না। বাঙ্গালী আসামে গেলে তাহাদের মায়ের স্তনের সাথে যে ভাষার সম্বন্ধ তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসামী ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসর বুর্জোয়া শ্রেণীর সৃষ্ট এই কুখ্যাত আসামের লাইন প্রথার অত্যাচারে হাজার হাজার কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হইয়াছে, শত শত কৃষক ও শ্রমিক দরদী নেতা ও কর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া নানাভাবে নির্যাতন করিয়াছে।

শেষ পর্যন্ত আসামের কংগ্রেস সরকার আমাকেও বন্দুকধারী পুলিশ দ্বারা আসাম হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। এবং বহিষ্কারের অনেক দিন পর পুনরায় আসামের নির্যাতিত কৃষক মজুর ভাইদের খোঁজখবর লইতে আসামে গমন করিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর কাল ধুবড়ী ও নওগাঁর জেলে আটক রাখিবার পর পুনরায় বন্দুকধারী পুলিশ দ্বারা আসাম হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

কৃষকদের দুঃখ দৈন্য মোচনের জন্য শুধু আমিই নহি, আমার এত হাজার হাজার কৃষক মজুর দরদী কর্মী ও নেতা সরকারের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিয়া, কারাবরণ করিয়া বাড়ীঘর, সহায় সম্পত্তি সমস্তই হারাইয়াছে।

আসাম সরকারের আদেশে, স্বাধীনতা লাভের পরও মুসলিম লীগ সরকারও মার্শাল ল' সরকারের আমলে নিরাপত্তা আইনের নামে বিনা বিচারে ১০ বৎসর কাল আমাকে কারাজীবন ভোগ করিতে হইয়াছে।

আমার মত বৃদ্ধ, আমার চাইতেও অনেক রোগাক্রান্ত শত শত দেশপ্রেমিক কারা যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। এখনও পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের কারাগারে বছরের পর বছর কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া দিনে দিনে তিলে তিলে মৃত্যুপথের যাত্রী হইতেছে।

এই সমস্ত দেশদরদী যদি আজ কারাগারের বাহিরে থাকিত, কৃষক জনসাধারণের এই বিপদকালে কৃষকদের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাদ্যশস্য কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, বন্যাপীড়িত এলাকায় চীনাবাদাম, তিসি, আখ প্রভৃতি নূতন রবিশস্য বুনানোর, জমিতে সার প্রদান করিবার পরামর্শ দিতে পারিত। পানি সেচের অভাবে, অনাবৃষ্টির ফলে এবার হাজার হাজার একর জমি সম্পূর্ণ অনাবাদী বা 'খিল' পড়িয়া থাকিবে। কৃষক ভাইরা আকাশের পানির দিকে চাতক পাখীর মত তাকাইয়া ও কপালে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে অথচ আজ ঐ সকল দেশপ্রেমিক কৃষক দরদী কর্মীরা বাহিরে থাকিলে মহকুমা

ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা কমিশনার অফিসারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পাম্পিং মেশিন বা সেচ মেশিনের জন্য বোর করিয়া পানি সেচের ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, যাহারা স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়াছে, পুলিশের লাথি গুঁতা খাইয়াছে, নির্মম অত্যাচার জুলুম সহ্য করিয়াছে, যাহারা দেশ ও দেশের মানুষকে সুখী সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছে, যাহারা কৃষক মজুর সর্বহারাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিতে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা, সংসার পরিজনের মায়া, সহায় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছে তাহারা আজও কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতে পচিতেছে।

আমার অতীত দিনের কথা আলোচনার সাথে একটি কথা আজ বলিয়া যাইতে চাই যে, দেশের শতকরা ৮৫ জন কৃষক ও ভূমিহীন মজুরদের বাঁচাইতে হইলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সরকারী অফিসারদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি অনাচার, অবিচার দেশ হইতে নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বয়স্কদের ভোটাধিকার দিয়া দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র কায়েম করিতে হইবে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, নিরক্ষর কৃষকদের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করতে, উন্নত ধরনের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য দেশে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা কায়েম করিতে হইবে। যে কোন নামে বা ফর্মেই হউক না কেন, দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে হইবে। সমাজতন্ত্র কায়েম ব্যতীত পাকিস্তানের বা কোন দেশের পক্ষেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, উন্নতি, দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না।

এই প্রসঙ্গে আমি নিম্নলিখিত করুণ ও ভয়াবহ পরিণতির প্রতি দেশবাসীর আশু দৃষ্টি কামনা করিতেছি—

বিগত ১৯৫১ পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২১ লক্ষ। ১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট বা লোকগণনায় সংখ্যা হইয়াছে ৫ কোটি ২৮ লক্ষ। দশ বৎসরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৮৩ লক্ষ। আগামী ১৯৭১ সালে গণনা হইলে, বার্থ কনট্রোলের জন্য বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও আমার বিশ্বাস লোকসংখ্যা দাঁড়াইবে ৬ কোটিরও অনেক বেশী। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের এক ইঞ্চিও বাড়িবে না। এমতাবস্থায় এই বর্ধিত লোকের জন্য অন্ততঃপক্ষে ন্যূনতম খাওয়া-পরা, থাকার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন না করিলে আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে,